(মধ্যপ্রদেশে ভ্রমন – ২০১৬)

২০১৬ সালের মার্চে মধ্যপ্রদেশের কয়েকটা জায়গা ঘুরলাম। এই যে গোটা চারেক জায়গা ঘুরলাম, সাধারনত একটা ট্যুর প্রোগ্রাম এদের নিয়ে হয় না। আমরা সোজা জব্বলপুর গিয়ে, ওখান থেকে এদিক ওদিক গেলাম। এই জব্বলপুর যাওয়ার পিছনে আমাদের একটা গল্প আছে।

আমার বারাকপুরের প্রতিবেশি দীনেশবাবু অনেকদিন জব্বলপুরে ছিলেন। এখনও প্রতি বছর এক দেড়মাস ওখানে ছেলের কাছে গিয়ে থাকেন। জব্বলপুরের অনেক গল্প ওনার কাছেই শুনেছি। একবার ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছা সেই থেকেই। আশেপাশে অনেক জায়গাই আছে। বিশেষকরে খাজুরাহো তো পৃথিবী বিখ্যাত। মুম্বই মেল ভায়া এলাহাবাদে গেলে জব্বলপুরের কিছু আগে সাতনা ষ্টেশন।সাতনায় নেমে লোকে খাজুরাহো যায়। তাও বোধহয় একশ কিমি দূরে। আমার কাছে সাতনার একটা অন্য আবেদন আছে। বাবা এই সাতনায় বছরখানেক ছিলেন, সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সম্ভবত যুদ্ধ বিমানের জন্য বিমানবন্দর তৈরীর কাজে।

আমার জন্মের বছর কুড়ি আগে বাবা মা সাতনায় থাকলেও, আমি মায়ের কাছে সাতনার নাম বহুবার শুনেছি। সাতনা হয়ে খাজুরাহো যাওয়া যায়, সে খবর জেনেছি এই সেদিন। আমাদের এবারের ভ্রমনে খাজুরাহো নেই। তাই ও নিয়ে কোন খবরও নিইনি। মুম্বই মেলের টিকিট কাটা হল মাস চারেক আগেই। সাথে সাথেই জব্বলপুরের রিটায়ারিং রুমও। ওখান থেকেই এক রাতের জন্য পাঁচমারি, তারপর এদিকে বান্ধবগড় জঙ্গলে সাফারী করে অমরকন্টক হয়ে ফেরা।

জব্বলপুর থেকে পাঁচমারি যাওয়ার জন্য পিপারিয়া পর্যন্ত ট্রেনে। ওটাও যাওয়া আসার টিকিট কাটা হল। জব্বলপুর থেকে ট্রেনে উমারিয়া, সেখান থেকে গাড়ীতে বান্ধবগড় যেতে হয়। উমারিয়ার টিকিটও কাটা হল। উমারিয়া থেকে ট্রেনে পেন্ড্রারোড এসে গাড়ীতে অমরকন্টক যাওয়া যায়। কিন্তু তাতে অনেক ঘোরা। তাই ওটা ট্রেনে যাওয়ার চেষ্টা করলাম না। কিন্তু ফেরার পথে পেন্ড্রারোড থেকে বিলাসপুর এসে আর একটা ট্রেনে কলকাতা। ঐ দুটি গাড়ীর টিকিটও কাটা হল।

পাঁচমারির হোটেলের জন্য নেটে খোঁজখবর চলল। শেষ পর্যন্ত সরাসরি জৈন হোটেলের মালিককে ফোন করে দুমাস আগে বুকিং হল। বান্ধবগড়ের জন্যও অনেক রিসার্চ করল ছেলে মেয়ে। দুমাস আগে একটা রিসর্ট আর দেড়মাস আগে সাফারী বুকিং হল। অমরকন্টকে মধ্যপ্রদেশ টুরিজমের লজে একটি বড় রুমও বুকিং হল মাস তিনেক আগেই।

দীনেশবাবু জানুয়ারিতে ছেলের কাছে গেছলেন। ওখান থেকে বান্ধবগড়ে ঘুরে এসেছেন। ওনার ছেলের প্রতিবেশি সতপাল ওনাদের গাড়ীকরে ঘুরিয়েছে। ওর গাড়ীতেই আমরা ঘুরতে পারি।

অমরকন্টক সম্বন্ধে পড়েছি তপোভুমি নর্মদা বইতে। কেমন যেন একটা প্রাচীন রহস্য আছে ঔ নামটাতেই। কমলভাই জানাল ওদের পাড়ার দুবেজী প্রতিবছরই অমরকন্টকে যান।একবার দুবেজীর বাড়ী যাবো অমরকন্টকের গল্প শুনতে। জানুয়ারিতে একদিন গেলাম, বরানগরে ওনার বাড়ী। উনি বছরে তিনবারও যান। গল্প খুব একটা হল না। লজে থাকার কথা শুনে বিরক্ত হলেন। জোর দিয়ে বললেন, ওটা কোন টুরিষ্ট স্পট নয়, থাকার জায়গা বলতে ধর্মশালা। ওখানে হোটেল বানানো নিশিদ্ধ।

দীনেশবাবু বান্ধবগড়ের কিছু অভিজ্ঞতা বললেও ওনার ছেলেই যেহেতু সব ব্যবস্থা করেছে, রিসোর্টের বা সাফারীর খরচ ইত্যাদি বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি। তবে সতপাল আর তার গাড়ী বেশ ভরসা করাযায় জানিয়েছেন।

আমরা রওনা দেওয়ার কদিন আগে সতপালকে জানাই। মুম্বই মেল জব্বলপুরে পৌছল ঘন্টাদুই দেরীকরে। বিকেলে সাতনা পৌছলে আমি প্লাটফর্মে নেমে ছবি তুললাম। বাবা মা কেউই আর নেই। বড়দার জন্মস্থান হলেও কোন রকমের আবেগ নেই। জব্বলপুরে অনেক কটা ঘর রিটায়ারিং রুমে। আমরা আমাদের ঘরদুটিতে ব্যাগপত্র রেখেই রেলের ভোজনালয়ে খেতে গেলাম। রাত হয়ে যাওয়ার বিশেষ কিছু পেলাম না। সতপাল সকালে আটটায় গাড়ী নিয়ে আসবে জানাল।

জব্বলপুরের রিটায়ারিং রুমের ঘরগুলি বেশ বড় বড়। আমরা সকালে আটটার আগেই ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে গেলাম। সতপাল সাড়ে আটটা নাগাত এল। ওর গাড়ীটা একটা বড় ভ্যান, আট নজন বসতে পারে। আমরা চারজন হাত পা ছড়িয়ে বসলাম। প্রথমেই ষ্টেশন এলাকার বাইরে একটা বড় দোকানে ঢুকে জলখাবার খেলাম। ওখানেই প্রথম "পোহা" খেলাম। চিঁড়ে সেদ্ধ করে হালকা তেল মশলা দিয়ে ভাজা। কাঁচা লংকা দিয়ে খেতে খারাপ নয়। এ জিনিস পরে ঔরঙ্গাবাদে বিবি কা মকবরার বাইরেও খেয়েছি।

আমাদের আজকের প্রোগ্রাম জব্বলপুর আর তার আসপাশ দেখা। জব্বলপুর থেকে মাইল কুড়ি দূরে ধুঁয়াধারা জলপ্রপাত আর মার্বেল রক্‌স বিখ্যাত দেখার জায়গা।

জব্বলপুর

জব্বলপুর বেশ ছড়ানো শহর। রাস্তা বেশ চওড়া। দীনেশবাবু এখানকার জাতীয় অস্ত্র কারখানায় চাকরী করতেন। শহরের একদিকে ঐ কারখানার বিরাট এলাকা। আমারা চলেছি পশ্চিম দিকে। শহরের ভেতরেই একটি জৈন মন্দিরে প্রথমে গেলাম। বিশাল এলাকা, বেশ সাজানো গোছানো। আমাদের পূজা দেওয়ার বালাই নেই, দেখলাম, ছবি তুললাম, বেরিয়ে এলাম। শহরের পশ্চিম দিকেই বিরাট এলাকা জুড়ে মেডিক্যাল কলেজ। নাম নেতাজী সুভাষ মেডিক্যাল কলেজ। বাঙালি হিসেবে একটু গর্ব তো হয়ই। ভাগ্যিস বাইরের লোকে জানেনা, কলকাতায় এই মহান বাঙালীর বাড়ী সংস্কার করার সময় তোলাবাজরা এসে বলেছিল, সুভাষদাকে ডেকে দিন। শহর এলাকা শেষ হওয়ার পরই বাঁ দিকে একটা সরু রাস্তা ধরে আধ কিমি ঢুকেই পৌছলাম, বিখ্যাত " ব্যালেনসিং রকে"। একেবারেই ফাঁকা একটু পাহাড়ি মত জায়গা। কিন্তু একটি বিরাট পাথরের উপর আর একটি বিরাট

পাথর কি করে বসে আছে ভাবলে অবাক হতে হয়। ওপরের পাথরটি লম্বা চওড়ায় প্রায় কুড়ি ফুট করে। নিচের পাথরের উপর যে জায়গাটা লেগে আছে সেটা এক ফুট মত হবে। দেখলে মনে হবে একটু বাতাস দিলেই পড়ে যাবে।

ওর কাছেই কোথাও পুরনো ফোর্ট আছে। সতপাল ওটার কথা বললই না। শহর ছাড়িয়ে পড়লাম একেবারে প্রান্তরে। ন্যাশনাল হাইওয়ে চলেছে সোজা পশ্চিম দিকে। দুপাশে শুধুই গমের চাষ। মাঝে মাঝে আম গাছ। রাস্তার পাশেও অনেক প্রাচীন আম গাছ দেখা গেল। কয়েক মাইল চলার পর আবার বাঁদিকে একটা সরু রাস্তায় ঢুকল গাড়ী। গম আর সর্ষের ক্ষেতের পাশদিয়ে মাইল খানেক যাওয়ার পর একটা মন্দির। কোন্ দেবীর মন্দির বোঝা গেল না। মন্দির বিরাট কিছু না হলেও যাত্রী যে প্রচুর আসে বোঝাগেল বেড়ার গায়ে বাঁধা নারকেল দেখে। মন্দির চত্তরে ঘোরার জন্য লোহার শক্ত বেড়ার ব্যবস্থা। তার গায়ে গায়ে লাল শালুতে বাঁধা নারকেল, কয়েক লক্ষ হবে। কত বছর ধরে জমছে জানি না। ভেতরের উঠানে একজন বসে বসে শুকনো নারকেল থেকে খোসা ছাড়াচ্ছে দেখলাম। সতপাল ঐ মন্দিরের মাহাত্ম্য বোঝানোর চেষ্টা করলেও আমাদের বিশেষ কিছুই মনে নেই।

আবার বড় রাস্তয় এসে পশ্চিম দিকে চলল গাড়ী। আরও মাইল দশেক যাওয়ার পর বাঁদিকে একটু সরু রাস্তায় আধ মাইল মত ঢুকলে কিছু দোকান পাট চোখে পড়ল। একটা টিলা মত দেখিয়ে সতপাল জানতে চাইল ওপরে যেতে চাই কিনা। ওপরে চৌষট্টি যোগীনি মন্দির। মন্দির শুনেই আর ওঠার উৎসাহ পেলাম না। আর মিনিট পাঁচেক চলে একটা মাঠমত জায়গায় পৌছে নামতে বলল। এদিক ওদিক বেশ কটা দোকানপাট। একটা দিকে এগিয়ে যেতে বলল ধুঁয়াধারা ফলসের জন্য। যে কোন টুরিষ্ট স্পটের মত দোকানপাটের লাইন। টুপি ব্যাগ ছাড়াও পাথরের নানান জিনিস বিক্রি হচ্ছে। বেশ কিছুটা হেঁটে নদীর দিকে যাওয়ার বাঁধানো রাস্তা পেলাম। ডানদিকে রোপওয়ে দেখাগেল। বন্ধ আছে। নদীর ভেতর দিয়ে অনেকটাই চলেগেছে বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে দুচারটি দোকান মত বসেছে। মার্চের প্রথম হলেও রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।

জলপ্রপাতের কাছে যেতে কুয়াশার মত জলকনা উড়ে এসে নাকেমুখে লাগতে থাকল। তখন আর রোদে অতোটা কষ্ট ছিল না। এই কুয়াশার জন্যই এই জলপ্রপাতের নাম ধুঁয়াধারা। নর্মদা নদীর চলার পথে অনেক জলপ্রপাত আছে। এটা সবথেকে চওড়া। আমারা যখন দেখি তখন প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া। জল লাফিয়ে পড়ছে অন্তত পনের ফুট নিচে।

নর্মদা এখানে অনেকটাই চওড়া। নদীতল গোটাটাই পাথরের। নিচের দিকটাও বড় বড় পাথরের চাঁই খাড়া হয়ে আছে। মূল নদীর কাছে যাওয়ার উপায় নেই। পাশ থেকে একটা সরু জলের ধারা বয়ে এসে একটু দূরে মূল ধারায় মিশেছে ; অনেকে ঐ ফুট খানেক জলে স্নান করছে।প্রপাতের একেবারে সামনে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেক ছবি তোলা হল।

রোপওয়েতে চড়ে প্রপাতের ওপর দিয়ে ওপাড়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ওপর থেকে একটু অন্যরকম তো লাগবেই। টুরিষ্ট স্পটের হরেক মজার ওটিও একটি। নিচে এতো কাছে যাওয়া যায়, তারপরও দড়িতে ঝুলে যাওয়া র কোন কারণ দেখি না। ফেরার পথে খুব সস্তা পাথরের খেলনা দেখা হল। ব্যাগে ছাতা রেখে যাওয়াটা বোকামিই হয়েছে। গাড়ীতে উঠে একই রাস্তা ধরে একটু পিছিয়ে এলাম।

একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সৎপাল বাঁদিকে গিয়ে একটু দেখে আসতে বলল। একটা ছোট মন্দির আছে। কিন্তু অনেক নিচ পাথরে ঘেরা নর্মদা দেখাযাচ্ছে। পরে জেনেছি ওটাকে সুইসাইড স্পট বলে। এরপর কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ী একেবারে ভেরাঘাটে পৌছেগেল। কিছুটা সিঁড়িদিয়ে নামলে অনেক ডিঙি নৌকা বাঁধা আছে।সাধারন নৌকা, বসার জন্য কটা পাটাতন। মাথায় রঙিন ছাউনি। জন দশেক যাত্রি হতেই ছেড়ে দিল। দাঁড়ের টানে চলল নৌকা। জল প্রায় স্থির। একটু চলার পরই মাঝি ছেলেটি মজার ছড়া কেটে আসপাশের বর্ননা দিতে থাকল। ক্রমশ নদীর বাঁকে নৌকা এগিয়ে চলল। একসময় দুপাশে উঁচু মার্বেল পাথরের দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখাযায় না।

এক একটা জায়গা বেশ ভুলভুলাইয়া মত। কুড়ি হাত দূর থেকে বোঝা মুশকিল কোনদিকে যাবে নৌকা। পাশের পাথরের দেওয়াল এক এক জায়গার এক এক রকম। কোথাও সাদা, কোথাও গোলাপি, কোথাও কালচে। একমাত্র কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রে নৌকা ভ্রমনের অনুমতি আছে। চাঁদের আলোয় যে ঐ জায়গা অপার্থিব লাগবে সেটা বোঝা যায়। মাইল খানেক গিয়ে ফিরে এলাম। নদীর জল কাঁচের মত স্বচ্ছ। এক মহিলা বোতল ভরে জল নিয়ে খেয়েও নিল। সেটা পিপাসায় না পূণ্য লোভে জানিনা। প্রকৃতির এই অপূর্ব সৃষ্টি সত্যিই মনেরাখার মত। এতখানি পাহাড় ভেঙে নর্মদা কি করে প্রবাহিত হয়েছে ভাবা জায় না।

ফেরার পথে বড় রাস্তার পাশের একটা ঝকঝকে হোটেলে দুপুরের খাওয়া সারলাম।

পাঁচমারি

দুপুরে ফিরে এলাম জব্বলপুর শহরে৷ শহরের ভেতরে একটা নতুন তৈরী হওয়া ট্যুরিষ্ট স্পটে নিয়েগেল আমাদের৷ বিরাট এলাকা জুড়ে একটা শিব মূর্তি৷ বেশ সাজানো মাঠ আর বাগানের মধ্যে বসানো পঞ্চাশ ষাট ফুট উচু শিব মূর্তি৷ ভক্ত জনের হয়তো ভালো লাগবে৷ দুপুর রোদে ঘোরার আর উৎসাহ ছিল না৷ চারটে নাগাত দীনেশবাবুর ছেলের বাসায় চলেগেলাম৷

পরে জেনেছি সৎপাল যে কোন কারনেই হোক আমাদের বর্গি ড্যাম জলাধারের কথা বলেইনি৷ ওটা নর্মদার ওপর একটা জলাধার৷ শহর থেকে একটু দূরে৷ ওখানে জলবিহারের বন্দোবস্ত আছে৷ এছাড়া ব্যালেনসিং রকের কাছেই রানী দূর্গাবতীর দূর্গ, এটাকেও সৎপালের দর্শনীয় মনে হয়নি৷

ঘটনাচক্রে ঐ দিনই দীনেশবাবুর ছেলে বাড়ী ছিলেন না৷ ওর সাথে দেখা হয়েছিল সাতনা ষ্টেশনে৷ ওনার স্ত্রী আমাদের যত্ন করে খাওয়ানোর পর সৎপাল আমাদের ষ্টেশনে পৌছে দিল৷ রাত্রে রিটায়ারিং রুমে থাকলাম৷ পরদিন সকালেই ট্রেন পিপারিয়া যাওয়ার৷

সকালেই স্নান সেরে ব্যাগপত্র নিয়ে রিটায়ারিং রুম খালিকরে নেমে এলাম৷ সকাল সাতটা নাগাদ পিপারিয়া যাওয়ার গাড়ী৷ আমাদের বসার আসন রিজার্ভ করা আছে৷ পিপারিয়া জব্বলপুর থেকে মুম্বই যাওয়ার রেল পথে৷ সারাদিনই অনেক গাড়ী আছে৷ একশ সত্তর কিমি মত রাস্তা ; ঘন্টা চারেক লাগে৷ মোটামুটি ঠিক সময়েই গাড়ী এল৷ সাধারন দ্বিতীয় শ্রেনীর কামরায় আমাদের আসন৷ জব্বলপুরে কামরা ফাঁকা ফাঁকা এলেও ক্রমশ বেশ ভীড় হল৷ গাড়ীটি এক্সপ্রেস, তবুও অন্তত সাত আটটা ষ্টেশনে দাঁড়াল৷ কয়েকটা ষ্টেশনে ফেরীওয়ালারা বড় বড় আলুমিনিয়ামের থালায় করে গোল গোল আলুবড়া বিক্রি করছিল৷ এক মিনিট গাড়ী থামলে প্রায় ৬০-৭০ টা বিক্রি করেফেলছে৷ আমরাও দুটি কিনে খেলাম, বেশ গরম৷

পিপারিয়া পৌছেগেলাম এগারোটা নাগাত৷ ষ্টেশনের বাইরে একটা গাড়ী ভাড়া করলাম পাঁচমারি পৌছে দেওয়ার জন্য৷ ছেলেটি ভদ্র৷ আমরা দুপুরেই পৌছে যাবো, বিকেলটা ওখানকার কয়েকটা দর্শনীয় স্থানও দেখাবে; এভাবেই ভাড়া ঠিক হল৷ পিপারিয়া থেকে পাঁচমারি যেতে ঘন্টা দেড়েক লাগল৷

ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়েই রাস্তা চলল প্রায় তিরিশ কিমি৷ তারপর একটু একটু করে পাহাড়ি রাস্তা৷ কখনও পাশে হালকা শালের বন৷ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রাস্তার পাশে একটা ভিউ পয়েন্ট দেখাগেল৷ অনেক নিচে একটা শুকনো নদীর মত দেখা গেল৷ বর্ষায় হয়তো জল থাকে৷ পাঁচমারিতে এরকমের অনেক ভিউ পয়েন্ট আছে৷ খুবই সাধারন একটা জায়গাকেই ভিউ পয়েন্ট বলে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে৷

জৈন হোটেলে আমাদের লাগেজ রেখে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম৷ তারপর বেরলাম কয়েকটা জায়গা দেখে নিতে৷ শহর ছাড়িয়ে চললাম পাহাড়ি রাস্তায় মহাদেব দেখতে৷ রাস্তার পাশে অনেক শাল জঙ্গল, রাস্তাটা সুন্দর৷ মহাদেব একটা গুহা৷ পাশ থেকে দেওয়াল বেয়ে জল পড়ছে টপ টপ৷ আশপাশের গাছপালায় নতুন পাতা ধরেছে, খুব সুন্দর৷ ওখান থেকে গাছপালার ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটা পথে আধ কিমি এগোলে গুপ্ত মহাদেব৷

গুপ্ত মহাদেব একটি খুবই সংকীর্ণ গুহা৷ একজনের বেশী পাশাপাশি ঢোকা যায় না৷ পাঁচজন বেরলে পাঁচজন ঢুকছে৷ তাই আধ ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হল৷ প্রায় কুড়ি ফুট ফাটলের মত গুহা৷ ভেতরে জনা পাঁচেক বসার মত জায়গা৷ একটি ছোট শিব লিঙ্গ৷ একজন মহারাজ বসে আছেন৷ প্রনাম করলে কপালে ছাইয়ের টিপ লাগাচ্ছে৷ ফেরার পথে একরকম কন্দের পাতলা টুকরো কিনে চিবিয়ে খেলাম৷ একটু মিষ্টি৷ শাঁকালুর মত ততোটা সুস্বাদু নয়৷ এরা যে বড় কন্দের থেকে কেটে দিচ্ছে, তার ওজন দশ কেজি হবে৷

গাড়ীতে ফেরার পথে নামলাম পান্ডব গুহায়৷ একটা পাহাড়ের গা কেটে বেশকটা গুহা তৈরী করা হয়েছিল৷ একটু সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে সবকটা গুহার কাছেই যাওয়া যায়৷ গুহায় কোন মুর্তি বা কিছুই নেই৷ কথিত যে পান্ডবরা বনবাসের সময় এখানে ছিল৷ শ খানেক ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়৷

নিচে অনেকটা এলাকা জুড়ে বাগান। সুন্দর সাজানো। চাগানের বাইরে ঘোড়ওয়ালারা ঘোড়ায় চড়ানের জন্য হাজির। ওখান থেকে একটা ঝিলের ঘাটে গেলাম। ওখানে বোটিং করা যায়। আমরা ঘাটের কাছে বাঁধা একটি উটকে খুব কাছের থেকে দেখলাম। এরপর আরও একটা গুহায় শিব লিঙ্গ দেখার জন্য গেলাম। নামটা জটেশ্বর বোধ হয়। দোকানপাট ইত্যাদি দেখে বেশ বোঝাযায় এটিও বেশ বিখ্যাত ট্যুরিষ্ট স্পট। পাথরের ধাপে ধাপে অনেকটাই নামতে হয়। ওঠার সময় পাহাড়ে তীর্থ করার মজাটা টের পাওয়া যায়।

সন্ধ্যার আগে হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলের মালিক অঙ্কিত জৈন সজ্জন মানুষ। পরদিন পাঁচমারি ভ্রমনের সুলুক সন্ধান দিলেন। ওখানকার

বিখ্যাত ফলস অর্থাৎ ঝরনাগুলি দেখতে হলে, নির্দিষ্ট সাফারী জিপ আর গাইড নিতেই হবে। জৈনই একজনকে ডেকে দিলেন। পরদিন সকালে স্নান করেই বেরিয়ে পড়ব ঠিক হল। সকালে উঠেই দুটি দুঃসংবাদ।

ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি পড়ছে। তার থেকে বড় বিপদ স্ত্রীর পেট খারাপ। সঙ্গে ওষুধপত্র ছিলই। কিন্তু একবেলায় সুস্থ হয়েযাবে তা তো হয় না। বৃষ্টি একটু বেলাতেই কমেগেল। গাড়ীর ড্রাইভারও এসে গেল। ওকে বললাম সব। ও বলল অন্য ভাড়া নিয়ে নিচ্ছে। স্ত্রীর অসুস্থতা শুনে জৈনও হতাশ হল। আমাদের অর্ধেক দেখা হয়েই আছে। বেলার দিকে যদি বেরনো যায় ; আর দু একটা স্পট হয়তো দেখতে পারি। পেট খারাপে আমাদের পছন্দের খাওয়ার মুড়ি। সমস্যা হল ওদিকে ঐ বস্তুকে কি বলে জানিনা। অনেক কসরত করে জৈন বুঝল যে ওটি ওদের "মুড়মুড়া"! এক প্যাকেট মুড়মুড়া কেনা হল। আর বেশ কয়েকটি ইলেকট্রাল এর প্যাকেট। বেলা দশটায় সুন্দর রোদ উঠল। এগারটা নাগাত স্ত্রী ও সুস্থ হয়ে উঠল। এবার জৈন আবার জীপ ডাকল। অর্ধেক ঘুরব বললেও ভাড়া একই।

পাহাড়ি এলাকায় ঘোরার বিপদ হল প্রচুর ওঠা নামা। জীপ এক যায়গায় খাড়া এক দেড়শো ফুট নামল। তারপর পাথরের ধাপে ধাপে অনেক নেমে, জঙ্গলের পথে এক কিমি হেঁটে একটা ভিউ পয়েন্টে পৌছলাম। একটু দূরে উল্টো দিকের পাহাড় থেকে একটা ঝরনা পড়ছে প্রায় একশ ফুট নিচে। এটা সিলভার ফলস। গাইড জানাল, সকালে রোদ পড়ে ওটা রুপালি লাগে, তাই ঐ নাম। বনের পথে পথে গাইডের পিছনে পিছনে হেঁটে আর একটা জায়গায় পৌছে দেখলাম অপ্সরা ফলস। এটা খুব নিচে নয়। ছেলে মেয়ে পাথরে পা দিয়ে দিয়ে নেমে গেল। পাথরের খাঁজে একটা ছোট্ট ডোবা মত হয়ে আছে। গাইড জানাল ঐ জলে মেমসাবরা স্নান করতে আসত। তাদের দেখেই স্থানিয়রা অপ্সরা বলত। এরপর গেলাম বিখ্যাত বী ফলস দেখতে। এটার জন্য দামি টিকিট। কিছুটা গিয়ে জীপ আর এগোবে না। অনেকটা হেঁটে একটা ঝোড়ার কাছে পৌছলাম। পাথরের ওপর দিয়ে বেশ বড় জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট সেতু বেয়ে ওপাড়ে গেলাম।

এই স্রোতটাই একটা ঝরনা হয়ে নিচে পড়ছে। অন্তত তিন চারশো ফুট নিচে। অনেক নিচে মানুষকে পোকার মত ছোট লাগছে। গাইড জানাল বনের ভেতর দিয়ে পাথুরে রাস্তায় নিচে নামাযায়। ওখানে লোকে স্নান করে। এত ওপর থেকে পড়ার জন্য জলের ফোঁটা গায়ে মৌমাছির হুলের মত ফুটতে থাকে, তাই নাম বী ফলস। নিচে নেমে আবার ফিরতে অন্তত দু ঘন্টা লাগবে। এত সময় আর শক্তি ও ছিল না, তাই ফিরে এলাম।

প্যারাগ্লাইডিং এর মাঠ দেখলাম রাস্তার পাশে। রিচ কেভ বা ভালুকের গুহা দেখতেও হাঁটতে হল। ওখানেই ইকো পয়েন্ট। দেন্না দর্শন পয়েন্ট থেকে দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা মন্দির দেখা যায়। শেষে একটা সাজানো বাগান দেখাল। কোন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি না প্রধানমন্ত্রির নামে ; ভুলেই গেছি।

আরও গোটা দুই অকিঞ্চিত্কর স্পটে ঘুরে হোটেলে ফিরে এলাম। দুপুরের খাওয়ার কথা বলে যাইনি, তাই রাখেও নি। কোন হোটেলেই খাওয়ার নেই,বেলা তিনটেতে। শেষে শুকনো খাওয়ার খেয়েই ফেরার গাড়ী ধরলাম। বিকেল পাঁচটার পর পিপারিয়া থেকে ফেরার গাড়ী। যথেষ্ট সময় থাকতেই এসে গেলাম।

বান্ধবগড়

পিপারিয়া ষ্টেশনে অনেক গাড়ী দাঁড়ায়। সম্ভবত পাঁচমারির যাত্রীদের জন্যই। কিন্তু বেশ নোংরা। পাঁচটার পর ট্রেনে উঠলাম। আমি উঠেই একটা ওপরের বাঙ্কে শুয়েপড়লাম। মাথায় একটি ব্যাগ। গাড়ী বেশ ঝাঁকানি দিয়েই চলছিল। সাড়ে আটটা নাগাত উঠে বসতে গিয়ে দেখি ভীষণ মাথা ঘুরছে। বুঝলাম স্পন্ডাইলোসিসের জন্য। চিন্তায় পড়লাম, নামব কি করে? ছেলে নিচে বসে ঢুলছিল। ওকে ডেকে জানালাম। অনেকক্ষণ উপুড় হয়ে শুয়েও গা গোলানো গেল না। জব্বলপুরে নামতে হবে। প্রচন্ড মনের জোর লাগিয়ে নেমে তো পড়লাম। নিচে নেমে বমি হল। জব্বলপুরে গাড়ী প্রায় খালিকরে সবাই নামল। ছেলে আমাকে ধরে নামাল; পা টলছে তখনও। প্লাটফর্মে নেমে গরম কফি খেয়েও খুব একটা সুবিধা হল না। কোনরকমে রিটায়ারিং রুমে পৌছেগেলাম।

পরদিন সকালে সৎপাল আসবে গাড়ী নিয়ে। রওনা দেব বান্ধবগড়। পোষাক পাল্টে শুয়েপড়লাম।

সৎপাল প্রায় নটা নাগাত এল। আমাদের যদিও উমারিয়া পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট কাটাই ছিল, আমরা কয়েকটা কারনে সৎপালের গাড়ী নিলাম, বান্ধবগড় যাওয়ার জন্য।

উমারিয়া থেকে বান্ধবগড় কুড়ি কিমি মত। বাস চললেও আমাদের জানা নেই সে বাসে ছাগল মুরগি নিয়ে ওঠে কিনা। ওখান থেকে গাড়ী নেওয়ার ব্যাপারে রেসর্টের লোকেরা নিরুৎসাহিত করল। তার থেকে বড় ব্যাপার আমরা পরদিন ওখান থেকে অমরকন্টক গাড়ীতে যাব। রেসর্টের গাড়ী নিলে অসম্ভব বেশী একটা ভাড়া বলেছে। অবশ্য সময় থাকলে উমারিয়া খেকে ট্রেনে পেন্ড্রারোড যাওয়া যায়।

এবার জব্বলপুরের উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে বেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে চললাম। রাস্তাটা ভালো। খুব বেশী গাড়ীর ভীড়ও নেই।জব্বলপুর শহরের ঐ দিকেই জাতীয় অস্ত্র কারখানা। কারখানার একটা গেট দেখলাম। মনে পড়ছিল দীনেশবাবুর কাছে শোনা কত গল্প। কারখানার এলাকার মধ্যেই অনেক পলাশ গাছ, ফুলে ফুলে লাল হয়ে আছে। রাস্তার দুপাশেই মাইলের পর মাইল পলাশের জঙ্গল। এতো পলাশ গাছ আর কোথাও দেখিনি।

জব্বলপুর শহর ছাড়ানোর পর রাস্তার দুপাশে ধুধু প্রান্তর। অনেক পরে পরে এক একটা ছোট গ্রাম। মাঠের রুক্ষতা দেখলেই বোঝা যায় আমাদের বাংলার গ্রাম কতো উন্নত। যে রাস্তা ধরে চলেছি এটা জব্বলপুর থেকে বিলাসপুর চলেগেছে। ঘন্টা দুই আড়াই চলার পর রামপুরি নামে একটা বড় বাজার এলাকায় পৌছলাম।

এখানে একটু থেমে, চা খেয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে উমারিয়ার দিকে চললাম। আবার সেই ফাঁকা মাঠের ভেতরের রাস্তা। উমারিয়া আরও এক ঘন্টার উপর। রেলের লেবেল ক্রশিং পেরিয়ে গাড়ী উত্তর দিকে চলল। উমারিয়া একটু পুরনো শহর। রাস্তার পাশে খোলার চালের ঘরও দেখলাম। উমারিয়া থেকে বান্ধবগড় মিনিট চল্লিশ রাস্তা। রাস্তায় বাস চোখে পড়ল না। বান্ধবগড় বাজারের মাইল তিনেক আগেই চেক পোষ্ট। পরে জেনেছি রাস্তার দুপাশেই জাতীয় অভয়ারন্য। বাঁশের ঝাড় ছাড়া তেমন কিছু গাছ দেখলাম না। রাস্তার পাশেই হনুমান আর হরিণও দেখা গেল।

এখানে একটু থেমে, চা খেয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে উমারিয়ার দিকে চললাম। আবার সেই ফাঁকা মাঠের ভেতরের রাস্তা। উমারিয়া আরও এক ঘন্টার উপর। রেলের লেবেল ক্রশিং পেরিয়ে গাড়ী উত্তর দিকে চলল। উমারিয়া একটু পুরনো শহর। রাস্তার পাশে খোলার চালের ঘরও দেখলাম। উমারিয়া থেকে বান্ধবগড় মিনিট চল্লিশ রাস্তা। রাস্তায় বাস চোখে পড়ল না। বান্ধবগড় বাজারের মাইল তিনেক আগেই চেক পোষ্ট। পরে জেনেছি রাস্তার দুপাশেই জাতীয় অভয়ারন্য। বাঁশের ঝাড় ছাড়া তেমন কিছু গাছ দেখলাম না। রাস্তার পাশেই হনুমান আর হরিণও দেখা গেল।

বান্ধবগড় বাজারটি একেবারে ছোট্ট একটা গঞ্জ মত। ওখানে জিজ্ঞাসা করে আমাদের রেসর্টের দিকে এগোলাম। বাজার ছাড়িয়ে এক কিমি মত এগিয়ে ডান দিকে গ্রামের মত ফাঁকা জায়গায় রেসর্ট। অনেকটা জায়গা জুড়ে, বাঁশের ঝাড় ইত্যাদির মধ্যে বেশ একটা গ্রাম্য পরিবেশ। আমরা পৌছে বুকিং দেখাতেই একজন কর্মচারি দৌড়াল জীপ ঠিক করতে। একটু দেরি হলেই বিকেলের সাফারী পেতাম না। আমাদের কটেজে ঢুকেই চমক। জানালার পর্দা সরিয়েই মেয়ে দেখে বাইরের বাঁশ বাগানে একটা শেয়াল। আমরা দেখতে দেখতেই দূরে চলেগেল। মনে পড়ল, দীনেশবাবু বলেছিলেন, রাত্রে খাওয়ার সময় জানালার বাইরে কটা শেয়ালের চোখ জ্বলতে দেখেছেন। আমরা ঐ একটিই দেখেছি। দুপুরে খাওয়ার পর ঘন্টাখানেক বিশ্রাম করেই সাফারীর জীপে উঠলাম।

জীপ বড় রাস্তা ধরে বাজার ছাড়িয়ে উমারিয়ার দিকে এক কিমি মত এগিয়ে বাঁ দিকে নামল। রাস্তা থেকে একশ গজ দূরে চেকিং। ওখানে কাগজপত্র দেখার পর গাইড উঠল জীপে। এবার জঙ্গলে ঢোকার পালা। আমরা ক্যামেরা রেডি করে বসে পাশের দিকে তাকিয়ে চললাম। প্রথমে কটা প্রাচীন আম গাছ। তারপর শাল আর বাঁশের জঙ্গল। খুব ঘন জঙ্গল কোথাও নেই। এরই মধ্যে হরিণ চরছে। প্রথম দিকে বেশকটা হরিণের ছবি তোলা হল। তারপর তো তিন ঘন্টায় বোধহয় তিনশ হরিণ দেখেছি। এছাড়া বাঁদর ও প্রচুর। ময়ুর ছাড়াও বেশ কয়েক রকম পাখি দেখাগেল। জঙ্গল বললে যেমন সুন্দরবন বা করবেটে একটা গা ছমছমে ভাব, এখানে তেমন প্রায় নেই। রাস্তাগুলি মাটির, গরুর গাড়ী চলার মত। এক জায়গায় পাঁচ সাতটা জীপ দাঁড়িয়েছে দেখে আমাদের জীপও চলল। পৌছেই দেখি বিরাট সারপ্রাইজ!

জঙ্গল সাফারী

সবকটা জীপের সব যাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে একদিকে তাকিয়ে আছে। সবার ক্যামেরা একদিকে তাক করা। গাড়ী থেকে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে একটি বড় গাছের হালকা ছায়ায় বসে আছে একটি বাঘ। জীবনে অনেকবার বাঘ দেখেছি। সার্কসে চিড়িয়াখানায় এমনকি খাঁচা গাড়ীর ভেতরে বসে বাগানে ছাড়া বাঘ, মুম্বাইয়ের সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্কে। কিন্তু একেবারে ওনার নিজের এলাকায়, নিজের মনে বসে আছেন বনের রাজা, এ একেবারে অভাবনীয়। এতগুলি লোক, সবাই উত্তেজিত ; কিন্তু কেউ চেঁচামেচি করছে না। একবার উনি উঠে দাঁড়িয়ে একদিকে তীক্ষ্ণ নজর দিলেন। এই যে এতোগুলি দু পেয়ে জীব ওনার জন্য আকুল, উনি একেবারে নির্বিকার। এভাবে মিনিট দশেক ওনার দর্শন পর্ব শেষকরে একটি একটি করে জীপ ওখান থেকে সরে পড়ল। উনি নিজের মত বসে থাকলেন। এবার খেয়াল হল, আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল ফরেষ্ট গার্ডদের একটি জীপ। আমাদের গাইড আর ড্রাইভারের কথায় বুঝলাম, ওরা একটু চিন্তায় পড়েছে, ওদের নামে রিপোর্ট হয়ে না যায়।

ওরাই জানাল, ওটি একটি বাঘিনী। দুটি বাচ্চা নিয়ে ওই এলাকায়ই ঘোরাঘুরি করছে কদিন। আমাদের আশা আরও বেড়েগেল, এই হয়তো দেখব দুটি বাচ্চা বাঘ ঘাসের ঝোপ থেকে বেরিয়ে মায়ের কাছে ছুটে আসছে। আরও একঘন্টা এদিক ওদিক ঘুরে, একটু খেলা জায়গায় গোটা চারেক ছোট বাড়ীর কাছে এসে জীপ থামল। ওগুলি গার্ডদের অফিস বোধহয়। ওখানে দরকার হলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বলল গাইড। ওখানেই একটা পোষা হাতি থাকে। আবার চলল জীপ। একটা মাঠের পাশ থেকে একটা প্রমান সাইজের ময়ুর উড়ে গিয়ে একটা গাছের ডালে বসল, খুবই বিরল দৃশ্য।

বিকেলের রোদ ক্রমশ কমে এল। জঙ্গলের রূপও ক্রমশ মায়াবী হতে থাকল। গোধূলির আলোয় একটু দূরে একটা মাঠে ময়ুর পেখম তুলেছে দেখলাম। আলো বেশ কমে এসেছে, আমরা ফেরার রাস্তায়। এক জায়গায় এসে গাইড গাড়ী দাঁড় করাল। বলল একটা ওয়ার্নিং কল শুনেছে। হঠাৎই মনে হল চারিদিক যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গাছের পাতাও যেন নড়ছে না। এভাবে মিনিট পাঁচেক থেকে চলতে শুরু করলাম।

বড় রাস্তায় যখন ফিরে এলাম, প্রায় অন্ধকার। জীপ আমাদের রেসর্টে নামিয়ে দিয়ে গেল। সৎপাল বলল ও রাত্রে রেসর্টের খাওয়ার খাবে না। দুপুরে ওকে ভালো খাওয়ার দেয়নি। আমরা একেবার রাতের খাওয়ার খেতে ডাইনিং হলে এলাম। ওরা জানাল ভেতরে সুইমিং পুলের কাছে ক্যাম্প ফায়ার আছে। ওদিকে গিয়ে দেখি বেশ কাঠের আগুন পোয়াচ্ছে কয়েকজন। আমরাও একটু বসলাম। সুইমিং পুলটি খুবই সুন্দর। একটি ছোট কুল গাছের তলায় পাকা কুল ছড়ানো। পরদিন ভোরে উঠে আর একটি সাফারী আছে। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে উঠে তৈরী হলাম। ভোরে একটু ঠান্ডা ছিল, আমার হাফ সোয়েটার লাগল। অন্ধকার থাকতেই সব চেকিং ইত্যাদি সেরে জঙ্গলে ঢুকলাম। আজ আরও বেশী গাড়ী দেখেছি। আজকের সাফারি অন্য এলাকায়, নাম মাগধি '; আগের দিনেরটা ছিল টালা। সেই একই ভাবে হরিণ আর

বাঁদর দেখতে দেখতে চললাম৷ ঘুরতে ঘুরতে বান্ধবগড় পাহাড়ের উল্টোদিকে চলে এসেছি৷ এদিকে কোথাও কোথাও একটু পাহাড়ি রাস্তাও আছে৷ এক জায়গায় বালির ওপর মহারাজের পায়ের ছাপ দেখলাম৷ এক জায়গায় দুদিকে সাত আট ফুট উঁচু ঝোপঝাড়, রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে একদল গাউর৷ কালো চকচকে গরুর মত, হাঁটু পর্যন্ত যেন সাদা মোজা পরা ; বড় দু তিনটির সাইজ বড় মোশের দ্বিগুণ৷ মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে ওদের পাতা খাওয়া দেখলাম৷

ওরা রাস্তার পাশে পাতা খেতেই থাকল৷ আমরা এগিয়ে গেলাম৷ জঙ্গলের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গায় অনেককটা জীপ এসে জুটল৷ এখানে গোটাকতক অস্থায়ি দোকানে চা বিস্কুট পাওয়া যাচ্ছে৷ এখানে মহিলাদের জন্য টয়লেটও আছে৷ আমরা চা আর ডিম টোষ্ট খেলাম৷ গোটা চারেক কুকুর পায়ে পায়ে ঘুরল৷ দোকানের ছেলেগুলো জানাল, ওরা দূরের গ্রাম থেকে সাইকেল চালিয়ে আসে৷ গ্যাস সিলিন্ডারও আনে৷ একজন লোক চা আর সিগারেট খাচ্ছিল৷ হঠাৎ অর্ধেক চা রেখে দোকানের ছেলেটাকে কি একটা বলে লাফিয়ে জীপে উঠল৷ জীপে বড় ক্যামেরা আছে দেখলাম৷ যা জানাগেল, লোকটি মাস তিনেক ওখানে আছে৷ রোজই জঙ্গলে ঢুকছে৷ কোথায় কোন কুল গাছের কাছে বাঘ দেখাগেছে শুনেই দৌড়েছে৷ আমরা একটু পর ঘুরতে ঘুরতে ঐ কুলগাছের কাছে এলাম৷ বাঘ বা জীপ কিছুই নেই৷ ঘুরতে ঘুরতে একটা মাঠ মত খোলা জায়গায় এলে গাইড দূরে পাহাড়ের দিকে দেখাল৷ অনেক সাদা সাদা ছোপ পাহাড়ের গায়ে৷ ওগুলো সব শকুনের পায়খানা বলল৷

একজায়গায় শাল গাছের নিচে অনেক হরিণ চরছে৷ গাইড দেখাল গাছে অনেক বাঁদর৷ বাঁদররা পাতা ফেলছে, হরিণরা তাই খাচ্ছিল৷নটার পর ফিরে এলাম৷ গেটের কাছে একটা বোর্ডে লেখা দেখলাম, বাঘ বলছে আমার এলাকায় ভ্রমনের জন্য ধন্যবাদ৷ আমাকে তুমি দেখতে পাওনি, আমি কিন্তু তোমাকে দেখেছি৷

রেসর্টে ফিরে স্নান করেই বেরলাম অমরকন্টকের জন্য৷ জঙ্গল ঘুরলে সবাই যেমন জানতে চায়, সৎপালও জানতে চাইল বাঘ দেখেছি কি না৷ একবার দেখেছি জেনে খুশী হল৷ ওই জানাল, আর একটা যে গাড়ী ওখানে ছিল, তার যাত্রীরা কান্হা থেকে ঘুরে এসেছে৷ ওখানেও বাঘ দেখেনি, এখানেও না৷ এবছর প্রথমদিকে আমার এক ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার বান্ধবগড়ে গিয়েছিল৷ খুব কাছের থেকে একটি বাঘের ছবি তুলে এনেছে৷

অমরকন্টক

সৎপালের গাড়ী একটানা চলে সাড়ে বারোটা নাগাত শাহপুরা পৌছল৷ ওখানে এটিএমে টাকা তোলা হল৷ বেশকটা দোকানে জিলিপি আর সিঙাড়া বিক্রী হচ্ছে৷ কিন্তু ওরা দুপুরের খাওয়ার বিক্রী করে না৷ বাজার ছাড়িয়ে একটু এগোলে রাস্তার পাশে ধাবা মত পেলাম৷ খুব ঝকঝকে না হলেও ভাত খাওয়া গেল৷ ওখান থেকে অমরকন্টক আরও চার ঘন্টার ওপর৷ আবার সেই প্রান্তরের ভেতর দিয়ে রাস্তা৷ মাঝে একটা পাহাড়ি মত জায়গা থেকে দূরে একটা শহর দেখা গেল৷ মিনিট দশেক পরে শহরটাতে পৌছলাম৷ ওটা ডিন্ডোরী জেলা শহর৷ সৎপাল ওখানে গাড়ীতে তেল ভরল৷ ক্রমশ বিকেল হয়ে এল৷ দু একটা ছোট গঞ্জের বাজার বসেছে রাস্তার উপর৷ এক জায়গায় রাস্তার দুপাশের গাছগুলি রাস্তার উপর এমনভাবে এসেছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে টানেলে ঢুকছে৷ একসময় দূরে দিকচক্রবালে কালো কালো পাহাড় দেখাগেল৷ সৎপাল জানাল, আমরা ঐ পাহাড়ে যাচ্ছি৷

আরও প্রায় আধ ঘন্টা মত চলে এবার ধুধু প্রান্তর থেকে গাছপালার মধ্যে ঢোকাগেল৷ একটু একটু করে শালের জঙ্গল বাড়তে থাকল৷ পাহাড়ি রাস্তায় খুব বেশি সময় চলতে হল না৷ রাস্তার ওপর প্রচুর বাঁদর ; সৎপাল গাড়ী চালাতে চালাতে হাত বাইরে বের করলেই বাঁদররা দৌড় আসছিল৷ পাহাড়ী রাস্তা ধরে এক দুজন গেরুয়াধারী হেঁটে যাচ্ছেন৷ মনে পড়ল তপোভুমি নর্মদার পরিক্রমাকারী সাধুদের কথা৷ হঠাৎই একটা উপত্যকায় হাজির হলাম৷ একটা লম্বা ঝিল মত পের হলাম পাকা সেতু দিয়ে৷ এরপর ঐ ঝিলের প্রায় পাড় ধরে গাড়ী চলল, দুটি একটি করতে করতে প্রায় শহরে ঢুকলাম৷ দু তিন জায়গায় জিজ্ঞাসা করে সরকারী ট্যুরিষ্ট লজে পৌছলাম৷ লজ একটা পাহাড়ের মাথায়৷ তখনো একটু বেলা ছিল৷ সৎপালের সাথে ওর গাড়ীর সামনে একটি ছবি তুলে ওকে বিদায় দিলাম৷ লজের রুমে ব্যাগপত্র রেখেই মন্দিরের দিকে যাবো বলাতে সৎপাল বলল ও নামিয়ে দিয়ে যাবে৷ লজের খাওয়ার জায়গায় সবাই চা খেয়ে আবার গাড়ীতে উঠলাম৷

মন্দির চত্তর অনেকটা নিচে৷ ওখানে আমাদের নামিয়ে সৎপাল ফেরার রাস্তা ধরল৷ একা একা প্রায় তিনশ কিমি ফিরবে, ভেবেই মনটা ভারী হয়েগেল৷ আমরা মন্দিরটা দেখেই লজে ফিরে আসব ভেবেছিলাম৷ যে কোন তীর্থ ক্ষেত্রের মত বিশাল বাঁধানো চত্তর৷ জুতো জমা রেখে ভেতরে যাওয়া৷ নর্মদা

উৎগম মন্দির ছাড়াও আরও কটা মন্দির আছে। একটি চৌবাচ্চা মত বড় পুকুর; চার পাশ সুন্দর করে ঘেরা। একজন কমবয়সী গেরুয়াধারী জলের পাশে বসে জপ করছেন। শুনেছি আমাদের গ্রামের পঞ্চানন বাবুর এক ছেলে ওদিকে পরিক্রমা করেছে; সেই নয়তো!

সন্ধ্যেয় আরতি হবে, বেশী দেরী নেই। আরতি দেখেই ফিরব ঠিক করলাম। বাজারটা একটু ঘুরে দেখতে গেলাম। ওখানেই একটি গাড়ী ঠিক হল পরদিন আমাদের ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য। আরতি দেখতে ফিরে গেলাম। একটি পাথরের ছোট হাতি আছে মন্দির চত্বরে। হাতির পেটের তলা দিয়ে শুয়ে পেরচ্ছে অনেকে। আমার ছেলেও পেরল। মোটা লোকেরা পেরতে পারছে না। আরতির সময় শ দেড়েক লোক হয়ে গেল। একজন পুরোহিতই আরতি করলেন। প্রায় আধঘন্টা ধরে আরতি চলল। অনেকেই পুরোহিতের সাথে সাথে হিন্দিতে স্তব কীর্তন করল।

আমার বেশ ঠান্ডা লাগছিল, আরতি শেষ হতেই লজের দিকে হন হন করে হাঁটা লাগালাম। দুবেজী ঠিকই বলেছিলেন ; বেশ কয়েকটি ধর্মশালা দেখলেও কোন হোটেল চোখে পড়ল না।

রাতের খাওয়ার লজেই সেরে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে উঠে আমার অভ্যেসমত হাঁটতে বেরব। এবার স্ত্রীও সঙ্গে চলল। মন্দির চত্তরে না ঢুকে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পুরনো লাল লাল মন্দিরগুলির দিকে গেলাম। ওগুলি পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের নেওয়া মন্দির ; এখন তাই সুরক্ষিত। সুন্দর বাগানও আছে। কোন মন্দিরে কোন দেবতা আছে বলে মনে হল না। মনে পড়ল তপোভুমির কাহিনী। শৈলেনবাবু আর এক বৃদ্ধ সাধুর সাথে যখন ঐ সব মন্দিরে যান, তখন ওগুলি বেশ জঙ্গলে ঘেরা ছিল। ওর একটি মন্দিরে ছিলেন নাঙ্গা সাধু শংকরনাথজী। ওখান থেকে বেরিয়ে নর্মদা মন্দিরের পিছনের রাস্তা ধরে হাঁটতে গিয়ে এক বিপত্তি। চায়ের দোকানের সামনে বিস্কুটের লোভে বসেছিল একটা বাঘা কুকুর। সে যেন আমার কত চেনা। কাছে এসে একেবারে দু পা গায়ে তুলে দিতে থাকল। আমার স্ত্রী তো ভয় পেয়ে গেল। দোকানের লোকেরা ডাকাডাকি করে ওকে ফেরাতে পারল না। আমার কিন্তু মনে হয়নি যে ও কামড়াবে। অমিতবাবুর কথাই ঠিক। ওরা বুঝতে পারে কোন লোকটি কুকুর ঘাঁটে। তখনও আমাদের আবাসনের নিচে পোটকাটা ছিল। তাছাড়া আগের দিনই বান্ধবগড় জঙ্গলে একটি কুকুরের গায়ে হাত দিয়েছি। এটাও অনেক দূর আমাদের সাথে সাথে এল। আমরা মন্দিরের সামনের একটা দোকানে চা খেয়ে ফিরে এলাম।

লজে ফিরে লজের বাগানে ঘুরতে গিয়ে গুলাবকাউলির গাছ দেখলাম। কলাবতী বা হলুদ গাছের মত দেখতে। এখন ফুলের সময় নয়, পরে ড্রাইভার ছেলেটি বলেছিল, শ্রাবণ মাসে ফুল হয়। এই ফুলের নির্যাস চোখের মহৌষধ, এমন কথা চালু আছে। আমার কিছু জানা নেই। ওখানে প্রায় সব গুমটি দোকানেই ঐ নির্যাস পাওয়া যায়। পরে আমি শোনমূড়ার বিখ্যাত আয়ুর্বেদের দোকান থেকে কিনেছি। দাম আছে। বিশেষ কোন উপকার পাইনি।

নটা নাগাত গাড়ী এল লজে। ব্যাগপত্র নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। ঐ গাড়ীই আমাদের পেন্ড্রারোড ষ্টেশনে পৌছে দেবে। বাজারের দিকে গেলাম প্রথমে। কিছু খেয়ে নিতে। ওখানেই অনেক গুমটি দোকানের পসরায় ছোট ছোট শিবলিঙ্গ দেখেছি। গোটাকতক কিনে নিলাম। এদের উৎপত্তিও বেশ চিত্তাকর্ষক । তপোভুমিতেই পড়েছি, নর্মদার একটি জলপ্রপাত, ধাবড়ি কুন্ডে এগুলি স্বাভাবিক ভাবেই তৈরী হয়। দোকানের মহিলা জানালেন, আজকাল আর তৈরী হয়না।

আমরা প্রথমে চললাম কবির চবুতরার পাশের রাস্তা ধরে কপিল ধারার দিকে। সকালে দেখেছি, ঐ কবির চবুতরার জলে অনেকই স্নান করছে। নর্মদার চলার পথে এই ঝিলটি, সম্ভবত একটু বাঁধের মত দিয়ে জলাধারের মত তৈরী।

বাঁদিকে থাকল চবুতরার ওপরের কালভার্ট, যেটা পেরিয়ে কাল বিকেলে এসেছি। মাইল দেড়েক যাওয়ার পর একটা মাঠের মত জায়গায় নামলাম গাড়ী থেকে। আসে পাশে কয়েকটা দোকানপাট। নেমে দশ পা হাঁটার পর পাকা রাস্তা শেষ। এবার মোরাম রাস্তা। দু দিকের পাহাড়ের ঢাল এসে একটি নালাতে মিশেছে। জল বইছে কিনা প্রায় দেখা যায় না।ঐ নালা পেরিয়ে অন্যপাড়ে এসেছি। দুপাশের পাহাড়েই সুন্দর শালের জঙ্গল। একটি মোটর বাইকে দুটি লোক আমাদের পেরিয়ে চলেগেল। এই মাইল দেড় দুই রাস্তা পেরতে শৈলেনবাবু জঙ্গলে পথ হারিয়েছিলেন ১৯৫২ সাল নাগাত। এখন ভাবলে রুপকথার গল্প মনে হয়। এই পথে জঙ্গলে বিরাট অজগর সাপ দেখে প্রান নিয়ে দৌড়েছিলেন উনি। অবশ্য আশির দশকেও আমাদের বাগচী ম্যাডাম অমরকন্টকে এসে জঙ্গলই দেখেছেন। ওনাদের ধর্মশালায় কোন শৌচাগার ছিল না।

মোরাম রাস্তায় তিন চারশো গজ এগিয়ে এক জায়গায় এ পাড়ের রাস্তা শেষ। কালভার্ট পেরিয়ে অন্যপাড়ে গেলাম। আগেই শব্দ পেয়েছি, পাশে একটা ঝরনা আছে। ঘুরে ঝরনার প্রায় সামনে থেকে দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। এটিই কপিল ধারা।

এখান বাঁদরের উৎপাত আছে। একটা ডালে মৌচাক। ডানদিকে একটু উপরে একটি একচালা পাকা ঘর। ওটি কপিল মুনির আশ্রম। শৈলেনবাবু এখানে নিচে পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে কদিন অজ্ঞান হয়েছিলেন। তখন এই আশ্রমে যে সাধু ছিলেন, তিনিই ওনাকে সুস্থ করেন। শৈলেনবাবুর মতে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনিই এখানে তপস্যা করেছেন। কপিলধারা ঐ সময় খুবই সরু ঝরনা ছিল। বর্ষায় নিশ্চয়ই জল অনেক বেড়ে যায়। জল পড়ছে অন্তত তিরিশ ফুট নিচে।

পাহাড়ের গা ধরে পায়ে চলার রাস্তা নেমেছে। ধাপে ধাপে একটু একটু করে নেমে চলল রাস্তা। তিনশ গজ মত নেমে দুধ ধারা। বেশ এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। পাশেই বেশ জঙ্গল। বোঝাযায় আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগে বেশ দুর্গম ছিল। একেবারে নিচে দুধ ধারার কাছে একটি লোহার সিঁড়ি আছে নিচে নামার জন্য।ওপর থেকেই দেখছি, জলের কাছে একটা ঘাট মত জায়গা। ওখানে একজন দেহাতি মত মহিলা স্নান করে পূজার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমরাও নিচে নামলাম। ঘাটের কাছে গেলে দেখাযায় একটা জলপ্রপাত মত; ফুট চার পাঁচ নিচে জল পড়ছে। জলে কেউ চাল ফেলেছে। কয়েকটি বাঁদর জলে হাত ডুবিয়ে সেই চাল তুলে খাচ্ছে। ঘাটের কাছে একটি গুহা। গুহার মধ্যে একজন কম বয়সের সাধু গেরুয়া পড়ে বসে আছে। আমাদের দেখে বলল ভেতরে গিয়ে পূজা দিতে। একটি ব্যাটারির আলো দিল রাস্তা দেখার জন্য। একটি বস্তায় কিছু নারকেল রাখা ছিল; একটি নিতে বলল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম। প্রায় কুড়ি ফুট ভেতরে একটি প্রদীপ জ্বলছে।

আমাদের সাথে সাথে ঐ মহিলা আর তার স্বামীও ঢুকল। প্রদীপের কাছে একটি ছোট শিবলিঙ্গ ছিল।ঢোকার সময় কি ঐ সাধু কিছু বলে দিয়েছিল? সম্ভবত বলেছিল নারকেল দিয়ে পূজা দিয়ে ১০৮ বার নমঃ শিবায় বলতে। ঐ গুহায় বশিষ্ঠ মুনি তপস্যা করেছিলেন, এমন কথাও বোধহয় ঐ সাধুই বলেছিল। বেরনোর সময় নারকেলের দাম চাইল।

ফেরার সময় টের পেলাম কতোটা উঠে আসতে হল। গাড়ীর কাছে ফিরে দোকানে চা খেলাম। আবার একই পথে ফিরে এলাম। এবার মন্দিরের পিছনদিকের পাহাড়ে চললাম। ওখানে একটি বড় মন্দির আছে। সম্ভবত লক্ষ্মী মন্দির। বন্ধ ছিল; ভেতরে ঢুকিনি।

এরপর ওদিকেই গেলাম মাই কি বাগিয়া,মায়ের বাগানে। এখানে লোকজন খুব আসে, বোঝাগেল দোকানপাট দেখে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে গাছপালা লাগানো। বেশীরভাগই আম গাছ। গাছগুলি খুব প্রাচীন মনে হল না। শৈলেনবাবু লিখেছেন, খুব সুন্দর বাগান। উনি দারুন সুগন্ধী গুলাবকাউলির কথা লিখেছেন। আমরা একটা ছোট্ট জায়গায় গোটাকতক গুলাবকাউলির গাছ দেখলাম। লজের বাগানে এর থেকে অনেক সতেজ গাছ ছিল। গাড়ীর ড্রাইভার ছেলেটিও বলেছিল, এই বাগানে নিশ্চয়ই থাকবে। ও এই ফুল সম্বন্ধে বলেছিল, ও নর্মদা মাতা কি সহেলি। বাগানে একটা ছোট্ট মন্দির আছে। এখান থেকে গেলাম শোনমূড়া। এ জায়গাটাই আমার সবথেকে চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। পাহাড়ের যে ঢালে নর্মদার উৎপত্তি, এটা তার উল্টো দিক। একটা সরু ধারা কুল কুল করে নামছে। এর পাশদিয়ে ধাপে ধাপে অনেকটা নামলাম। শোন নদী একটা ঝর্ণার মত কয়েকশ ফুট নিচে পড়ছে। দেখার জন্য শক্ত রেলিং আছে। বহু নিচে গাছপালার ভেতর নদী চলেগেছে, ওপর থেকে কিছু দেখা যায় না। এই শোন নদী বিহারে কী বিশাল এখানে দেখে বোঝার উপায় নেই। একটু ওপরে একটা বেশ বড় আয়ুর্বেদের দোকান। ওখানে গুলাবকাউলির ড্রপ কিনলাম।

এরপর চললাম অমরকন্টকে আমাদের শেষ দর্শনীয়, জৈন মন্দির দেখতে। এটা আমাদের লজের দিকেই। বিরাট মন্দির। এখনও তৈরী হচ্ছে। গোটা চত্তর বিশাল বিশাল মার্বেল পাথর ছড়ানো। জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকলেও মন্দিরে বালি ছড়ানো। মহাবিরের বড় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বাইরে দোকানপাটের মেলা। একটা দোকানে চা খেয়ে গাড়ীতে উঠলাম।

সেই কালভার্ট পেরিয়ে কবির চবুতরার অন্যপাড়ে এলাম। কিন্তু কোথাদিয়ে পেন্ড্রারোড যাওয়ার রাস্তায় এলাম বুঝলাম না। এই রাস্তায় মাইল দুই এগিয়ে জলেশ্বর শিব মন্দির। খুবই সাধারন মন্দির। পাশে একটি কুঁয়া। কুঁয়ার জলে হাত পা ধুয়ে মন্দিরে ঢুকতে হয়। শৈলেনবাবু এ মন্দিরের কি সব মাহাত্ম্য লিখেছেন; এখন আর কিছু মনে নেই। মন্দিরের বাইরে একটি ঘরের থেকে ছোট শালপাতার বাটিতে খিঁচুড়ি প্রসাদ দিল।

ওখান থেকে গেলাম আর একটি নতুন শিব মন্দিরে। ফাঁকা মাঠের ভেতর মন্দির , মহাকালেশ্বর। বিরাট নাট মন্দিরের পাশে পাশে অনেক শিবলিঙ্গ বসানো। মূল মন্দিরের শিবলিঙ্গটি কুড়ি ফুট মত উঁচু। ওপরে উঠে জল দেওয়ার জন্য সিঁড়ি করা আছে। কম বয়সী পূজারীকে আমার স্ত্রী প্রসাদ চাওয়ায় একদিকে স্তুপাকারে রাখা নারকেল থেকে একটা নিতে বলল। পেন্ড্রারোড থেকে আমাদের গাড়ী ধরতে হবে, তাই ফেরার রাস্তা ধরলাম।

বিলাসপুরের ইশটিশনে

মহাকালেশ্বর মন্দিরের থেকে বেরিয়ে সোজা চললাম পেন্ড্রারোড ষ্টেশনের দিকে। গাড়ী মিনিট দশেক গাছপালায় ঘেরা পাহাড়ি রাস্তায় চলে আবার সেই ধুধু প্রান্তরে এসে গেল। রাস্তা একেবারে জনহীন। চার পাঁচ মাইল পর পর দু একটা বাড়ীঘর। তিরিশ কিমি মত রাস্তা এক ঘন্টাও লাগল না। এই রাস্তাটা নিয়ে আমার মনে একটা অন্যরকম ধারনা ছিল। তপোভুমি নর্মদায় শৈলেনবাবু লিখেছেন, বৃদ্ধ সাধুর সাথে হেঁটে এই রাস্তা দিয়ে অমরকন্টকে গিয়েছিলেন। মাঝে ভোটেঙ্গার জঙ্গলে দিনের বেলাতেও লোকে ভুতের বাঁশি শুনতে পেত। ওনাদের সামনেদিয়ে ভালুকের বাচ্চা, উলের গোলার মত গড়িয়ে গেছে। আমাদের কলেজের দাদা ডা কুন্ডু জানিয়েছেন, শ্যাডোলে ওনার কোয়ার্টারের পাশে ভালুক আর অজগর ঘুরতো। গত পঞ্চাশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যেই কি পরিমান পরিবর্তন হয়েছে ভাবাই যায়না। মেদিনীপুরে আমাদের গ্রামের বাড়ীর থেকে একশ গজ দূরের বনে শেয়াল ডাকত, ছোটবেলায় শুনেছি।

আমরা ট্রেনের সময়ের এক দেড় ঘন্টা আগেই পেন্ড্রারোড পৌছে গেলাম। ষ্টেশনের বাইরে একটি হোটেলে খেয়ে নিলাম। ষ্টেশনে ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করে বিলাসপুরের গাড়ীতে উঠলাম। বিলাসপুর আড়াই ঘন্টা মত লাগল। একটু বেলা থাকতেই পৌছেগেলাম। এখান থেকে আমাদের গাড়ী রাত দশটায়। ঘন্টা চারেক শহরটা ঘোরাযায় কিনা খোঁজখবর নিলাম। বিশেষ কিছু দেখার নেই জেনে ওয়েটিং রুমেই বসে কাটালাম। ওখানে ব্যাগপত্র রেখে প্লাটফর্মে ইতস্ততঃ ঘুরতে গিয়ে একটা জিনিস চমকে দিল।

প্লাটফর্মে একটি বড় বোর্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি আর একটি বাংলা কবিতা। কবি একবার এই ষ্টেশনের বসার ঘরে ছয় ঘন্টা বসে ছিলেন। সে কথা তাঁর “ ফাঁকি” কবিতায় লিখেছেন। আজ আবার পড়লাম কবিতাটি। বড়ই মর্মস্পর্শী। আমারাও চারঘন্টা বসে বসে বিরক্ত হলাম। মাঝে একবার ছেলেকে নিয়ে ষ্টেশনের বাইরে বাজারে ঘুরে এলাম।

বাজারে ফল কিনে ফেরার সময় সিঙাড়া খেলাম। ওখানে ছোট থালায় সিঙাড়া ভেঙে একটু ঝোল ছড়িয়ে খেতে দেয়। আমাদের গাড়ী প্রায় ঠিক সময়েই এল। ফেরার শেষ গাড়ীতে উঠে নিজেদের বাঙ্কে শুয়েপড়া মানেই ভ্রমণ শেষ।

একটা গাড়ী দেখছি সাত্রাগাছি থেকে সপ্তাহে একদিন ছাড়ে। রাত্রে ছেড়ে পরদিন দুপুরেই পেন্ড্রারোড পৌছয়। ওখান থেকে অমরকন্টকের বাসও আছে। এজন্যই বোধহয় নর্মদা মন্দিরের আরতির সময় অনেক বাঙালি দেখেছি। অমরকন্টকই বোধহয় এখনও হট্টগোল মুক্ত তীর্থস্থান। কতদিন আর থাকবে জানিনা।